সুভাষচন্দ্রের চেতনায় স্বামী বিবেকানন্দ

ড. শেখর কুমার শেঠ

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ভারতের স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান আমাদের স্মরণীয়। উন্নত শির, আপোসহীন, সাহসী, তেজোদীপ্ত, অকুতোভয় সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় মানসিক শক্তির আধারের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। সুভাষ চন্দ্রের জীবনে ছাত্রাবস্থায় বিবেকানন্দের যে প্রবেশ, সারা জীবনেই যেন তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়েছিল। স্বাধীনতার রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ বাহিনির যোদ্ধাদের সকলকে এক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার মধ্যেও তাঁর প্রভাব দেখা যায়। ফলে দেশের জন্য প্রাণ বলিদানেও সকলে প্রস্তুত ছিল।

সুভাষচন্দ্রের পিতার নাম ছিল শ্রী জানকীনাথ বসু, যিনি সেই সময়ে কটক শহরের একজন বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন এবং মাতা ছিলেন শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। তিনি ছিলেন তাঁর পিতা মাতার চোদ্দ সন্তানের মধ্যে নবমতম সন্তান। তাঁর মেজদা ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, যিনি তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং ছোট্ট নেতাজিরও খুব কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। নেতাজির মধ্যে দেশপ্রেম ব্যাপারটা জাগে তাঁর পিতার হাত ধরেই, যদিও তাঁর পিতা একজন ব্রিটিশ শাসিত সরকারি অফিসে কর্মরত ছিলেন।

স্কুলে পড়ার সময়, তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষকমশাই বেনিমাধব দাসের ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। যখন বয়স ১৫, ওই সময়ে তিনি তার প্রতিবেশী আত্মীয় সুহৃৎচন্দ্র মিত্রর কাছ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা কয়েকটি বই ধার করেছিলেন। বিবেকানন্দের জীবনী, তাঁর লেখা পত্রাবলি ও বাণী পড়া শুরু হল। শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে এই সেই বই এবং শিক্ষা যা তিনি সন্ধান করছিলেন। স্বামীজির থেকে দেশের জন্য আত্মত্যাগ এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করার আদর্শ ও অনুপ্রেরণা পেলেন। ক্রমে তিনি বিবেকানন্দের গুরু শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে এক মহৎ জীবনের আলোর দিশা অনুভব করলেন। স্বাভাবিক ভাবেই শ্রী রামকৃষ্ণ এবং মা সারদার ভাবধারাও তাঁর শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণার এক আধার হিসাবে দেখা দিল। বলা চলে এক নতুন আলোর দিগন্তে প্রবেশ করলেন।

সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ 'ভারত পথিক'-এ তা সুস্পষ্ট। তাঁর কথায়—

'আমাদের এক আত্মীয় (সুহৃৎচন্দ্র মিত্র) কটকে নতুন এসেছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে বসে বই ঘাঁটছি, হঠাৎ নজরে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলোর উপর। কয়েক পাতা উল্টেই বুঝতে পারলাম এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ি নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয়মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। প্রধান শিক্ষকমশাই আমার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, নৈতিকবোধ জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন কিন্তু এমন আদর্শের সন্ধান দিতে পারেননি যা আমার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র এবং বক্তৃতা। তাঁর লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম।'

...মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশের সেবাও বুঝেছিলেন। তাঁর জীবনীকার ও প্রধান

সান্ত্বনা পেতাম বন্ধুদের কাছে -কাজেই যতক্ষন বাড়ির বাইরে বন্ধুদের মাঝে থাকতাম অতটা কষ্ট হত না।

...লেখাপড়া ছেড়ে এখন আমার কাজ হল যোগ অভ্যাস করা। যোগ শেখাতে পারে।'

সুভাষ চন্দ্র আরো লিখেছিলেন—'গত শতাব্দীর আশির দশকে, ২ জন বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আবির্ভুত হয়ে ছিলেন, যাঁদের প্রভাব নতুন ভবিষ্যতের উপর বিরাট ভাবে পড়েছিল। তাঁরা ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ... রামকৃষ্ণ সকল ধর্মের সম্মিলন প্রচার করেছিলেন এবং আন্তঃ ধর্মীয় বিবাদ বন্ধ করার আহ্বান জানান। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর শিষ্যকে ভারতে ও বিদেশে তাঁর ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার করার এবং তার দেশবাসীর মধ্যে একটি স্ফুলিঙ্গ জাগ্রত করার কাজ করার ভার দিয়েছিলেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর কাছে ধর্মই ছিল জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরক। তিনি নতুন প্রজন্মকে ভারতের অতীত নিয়ে গর্বের অনুভূতি, ভারতের ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানের চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।'

যদিও স্বামীজি কখনো কোনো রাজনৈতিক বার্তা দেননি, তবে তাঁর বা তাঁর লেখার সংস্পর্শে আসা প্রত্যেকের মধ্যেই দেশপ্রেমের মানসিকতার বিকাশ ঘটায়। স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক জনক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণেই তিনি তাঁর দেশবাসীর উপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছিলেন। ত্যাগের ক্ষেত্রে অদম্য, প্রজ্ঞায় গভীর এবং বহুমুখী ভাবে উচ্ছ্বসিত। তিনি ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্ব।... 'তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন এবং তাঁর দেশবাসীর উত্থানের জন্য বেদান্তকে ব্যবহারিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পুরো জীবন তাঁর দেশবাসী ও মানবতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কাটিয়েছেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তবে আমি তাঁর পায়ে থাকতাম। আমার জীবন শ্রী রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের পবিত্র প্রভাবের মধ্যে প্রথম জাগ্রত হয়েছিল। নিবেদিতার মতো আমিও শ্রী রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে এক অদৃশ্য ব্যক্তিত্বের দুটি দিক হিসাবে বিবেচনা করি। স্বামীজি যদি বেঁচে থাকতেন তবে তিনি আমার গুরু ছিলেন।'

'আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিনে আমি শ্রী রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকব'...স্বামীজি তাঁর রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক প্রভাবিত করেছিলেন। ...স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে ভ্রূণের হাত থেকে মুক্ত করে সত্যিকারের মানুষ বলে অভিহিত করেছিলেন এবং ধর্মের সংহতির সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে ভারতে সত্যিকার জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

অনেকের মতে সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের মানস পুত্র ছিলেন। নেতাজি বিবেকানন্দকে আধুনিক ভারতের নির্মাতা হিসাবে বর্ননা করেছিলেন। আধুনিক সমাজে মানবিক সংকট নিরসনের পথ দেখানোর জন্য স্বামীজি সবচেয়ে ব্যবহারিক পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। দেশকে পুনর্গঠন করার বিষয়ে স্বামীজির দার্শনিক ধারণাগুলি দ্বারা নেতাজি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে স্বামী বিবেকানন্দের মতো সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস করেছিলেন যে প্রতিটি মানুষই ব্রহ্মের পরমাত্মার প্রকাশ।

বিবেকানন্দের মতো সত্যিকারের মানবতাবাদী সুভাষচন্দ্র বস্তুগত অগ্রগতির পরিবর্তে নৈতিক অগ্রগতিকে পছন্দ করেছিলেন। ১৯২৯ সালের অক্টোবরে লাহোরে অনুষ্ঠিত ছাত্র সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির ভাষণে তিনি ভারতের জন্য তাঁর স্বাধীনতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'এই স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি নয়, সম্পদের সমান বন্টন, বর্ণগত বাধা ও সামাজিক অসাম্প্রদায়িকতা বিলোপ এবং সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ধ্বংসকে বোঝায়।' তিনি চেয়েছিলেন যে সমাজে জমিদার, পুঁজিবাদী

সান্ত্বনা পেতাম বন্ধুদের কাছে -কাজেই যতক্ষন বাড়ির বাইরে বন্ধুদের মাঝে থাকতাম অতটা কষ্ট হত না।

...লেখাপড়া ছেড়ে এখন আমার কাজ হল যোগ অভ্যাস করা। যোগ শেখাতে পারে।'

সুভাষ চন্দ্র আরো লিখেছিলেন—'গত শতাব্দীর আশির দশকে, ২ জন বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আবির্ভুত হয়ে ছিলেন, যাঁদের প্রভাব নতুন ভবিষ্যতের উপর বিরাট ভাবে পড়েছিল। তাঁরা ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ... রামকৃষ্ণ সকল ধর্মের সম্মিলন প্রচার করেছিলেন এবং আন্তঃ ধর্মীয় বিবাদ বন্ধ করার আহ্বান জানান। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর শিষ্যকে ভারতে ও বিদেশে তাঁর ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার করার এবং তার দেশবাসীর মধ্যে একটি স্ফুলিঙ্গ জাগ্রত করার কাজ করার ভার দিয়েছিলেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর কাছে ধর্মই ছিল জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরক। তিনি নতুন প্রজন্মকে ভারতের অতীত নিয়ে গর্বের অনুভূতি, ভারতের ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানের চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।'

যদিও স্বামীজি কখনো কোনো রাজনৈতিক বার্তা দেননি, তবে তাঁর বা তাঁর লেখার সংস্পর্শে আসা প্রত্যেকের মধ্যেই দেশপ্রেমের মানসিকতার বিকাশ ঘটায়। স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক জনক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণেই তিনি তাঁর দেশবাসীর উপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছিলেন। ত্যাগের ক্ষেত্রে অদম্য, প্রজ্ঞায় গভীর এবং বহুমুখী ভাবে উচ্ছ্বসিত। তিনি ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্ব।... 'তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন এবং তাঁর দেশবাসীর উত্থানের জন্য বেদান্তকে ব্যবহারিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পুরো জীবন তাঁর দেশবাসী ও মানবতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কাটিয়েছেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তবে আমি তাঁর পায়ে থাকতাম। আমার জীবন শ্রী রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের পবিত্র প্রভাবের মধ্যে প্রথম জাগ্রত হয়েছিল। নিবেদিতার মতো আমিও শ্রী রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে এক অদৃশ্য ব্যক্তিত্বের দুটি দিক হিসাবে বিবেচনা করি। স্বামীজি যদি বেঁচে থাকতেন তবে তিনি আমার গুরু ছিলেন।'

'আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিনে আমি শ্রী রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকব'...স্বামীজি তাঁর রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক প্রভাবিত করেছিলেন। ...স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে ভ্রূণের হাত থেকে মুক্ত করে সত্যিকারের মানুষ বলে অভিহিত করেছিলেন এবং ধর্মের সংহতির সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে ভারতে সত্যিকার জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

অনেকের মতে সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের মানস পুত্র ছিলেন। নেতাজি বিবেকানন্দকে আধুনিক ভারতের নির্মাতা হিসাবে বর্ননা করেছিলেন। আধুনিক সমাজে মানবিক সংকট নিরসনের পথ দেখানোর জন্য স্বামীজি সবচেয়ে ব্যবহারিক পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। দেশকে পুনর্গঠন করার বিষয়ে স্বামীজির দার্শনিক ধারণাগুলি দ্বারা নেতাজি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে স্বামী বিবেকানন্দের মতো সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস করেছিলেন যে প্রতিটি মানুষই ব্রহ্মের পরমাত্মার প্রকাশ।

বিবেকানন্দের মতো সত্যিকারের মানবতাবাদী সুভাষচন্দ্র বস্তুগত অগ্রগতির পরিবর্তে নৈতিক অগ্রগতিকে পছন্দ করেছিলেন। ১৯২৯ সালের অক্টোবরে লাহোরে অনুষ্ঠিত ছাত্র সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির ভাষণে তিনি ভারতের জন্য তাঁর স্বাধীনতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'এই স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি নয়, সম্পদের সমান বন্টন, বর্ণগত বাধা ও সামাজিক অসাম্প্রদায়িকতা বিলোপ এবং সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ধ্বংসকে বোঝায়।' তিনি চেয়েছিলেন যে সমাজে জমিদার, পুঁজিবাদী

এবং উচ্চতর শ্রেণির সুযোগ-সুবিধা হ্রাস করা হোক। তিনি বলেছিলেন, 'মুক্ত ভারত পুঁজিপতি, ভূস্বামী এবং বর্ণের দেশ হবে না। মুক্ত ভারত হবে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র...। মুক্ত ভারতে নিখুঁত সাম্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রাজত্ব বিরাজ করবে।'

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধার এক অনুপম কাহিনির উল্লেখ আমাদের অভিভুত করে। নেতাজি তখন সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে। তাঁর স্টেনো ছিলেন ভাস্করণ। তাঁর বয়ান সিঙ্গাপুরে থাকবার সময় নেতাজি মাঝে মাঝে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের দিক থেকে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন।

সমস্ত দিনমান তাঁর কর্মসূচি কাজের ভিড়ে ঠাসা, দিনের বেলা তাই সময় হত না। কখনো কখনো গভীর রাত্রে সব কাজ কর্ম সেরে শুতে যাবার সময় ড্রাইভারকে ডেকে বলতেন, গাড়ি বার কর, আশ্রমে যাব। চলে যেতেন একা। এমনকী দেহরক্ষী সঙ্গে থাকলেও বিরক্ত হতেন। হয় আমাকে না হয় ওঁর এ ডি সি-দের কাউকে বলে যেতেন তোমরা শুয়ে পড়, আমি মিশনে যাচ্ছি।

আমরা ওঁর অজান্তে তৎক্ষণাৎ রামকৃষ্ণ মিশনে ফোন করে দিতাম। স্বামীজির সঙ্গে আমাদের তলায় তলায় বন্দোবস্ত করাই থাকত। আমাদের টেলিফোন পেলেই ওঁরা সচকিত হয়ে উঠতেন। ওঁর গাড়ি আশ্রমে পৌছালেই তাঁরা আবার ফোন করে আমাদের জানিয়ে দিতেন। আমরা জেগে বসে থাকতাম। আবার ঘন্টা দু-তিন পরে বেজে উঠত টেলিফোন। স্বামীজি জানাতেন, এইমাত্র নেতাজির গাড়ি রওনা হয়ে গেল। আমরা নেমে আসতাম নীচে। রাতের নির্জন রাস্তায় এ পথটুকু গাড়িতে যেতে মিনিট পনের লাগে। শুনেছি, মিশনে পৌছে নেতাজি ফৌজী পোশাক খুলে ফেলতেন। পরতেন গেরুয়া রঙের একটি সিল্কের ধুতি। নগ্নগাত্রে শুধুমাত্র সিল্কের উত্তরীয়। ওঁর হাত-ব্যাগে সব সময়েই থাকত তিনটে জিনিস: একটি পকেট-এডিশন গীতা, এক জোড়া বাড়তি পড়বার চশমা, আর একটা রুদ্রাক্ষের জপমালা। ঠিক জানি না, জনশ্রুতি এই তিনটি অমূল্য সম্পদ নাকি একদিন মৌলভী জিয়াউদ্দিনের সহযাত্রী হয়ে রওনা হয়েছিল এলগিন রোডের বাড়ি থেকে কালো রঙের BLA7169 গাড়িতে, তারপর আফগানিস্তান, মস্কো, ইটালি, জার্মানি, মাদাগাস্কার, টোকিও, ব্যাঙ্কক ঘুরে এসে পৌচেছে এই সিঙ্গাপুরে। দরজার বাইরে পড়ে থাকত টুপি-ব্রিচেস-টপ বুট। রুদ্ধদ্বার কক্ষে পটের সামনে ধ্যানে বসতেন উনি। সিংহাসনের মাঝখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, এ-পাশে শ্রীশ্রীমা ও-পাশে স্বামী বিবেকানন্দ। মহারাজ জ্বেলে দিয়ে যেতেন কয়েকটি ধূপ, নিবিয়ে দিতেন বৈদ্যুতিক আলো, পিলসুজের উপর জ্বালিয়ে দিতেন প্রদীপ বেদীর পাদমূলে আমাদের টেলিফোন পেলেই। বাইরে ব্ল্যাক-আউটের নিশ্ছিদ্রতমসা, জাপানি সাইরেনেরতীক্ষ্ম শীতকার, কখনো-বা কার্পেট বম্বিং এর নিরবচ্ছিন্ন বিস্ফোরণ আর ঘৃত প্রদীপ জ্বলা সাধনকক্ষে সমংকায়শিরগ্রীব একক সন্ন্যাসী নিবাত নিস্কম্প দীপশিখার পাশে বসে আছেন তারই উপমান হয়ে প্রহরের পর প্রহর, ইম্ফল-কোহিমা এমনকী গোটা ভারতবর্ষটা ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যেত ক্রমে-চৈতন্যময় জগতে পরম জোতির্ময়ের ভিতর বিলীন হয়ে যেত মুক্তিকামী এক জীবাত্মা!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ সুভাষচন্দ্র বসুর 'ভারত পথিক'
নারায়ণ সান্যাল এর 'আমি নেতাজীকে দেখেছি—প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী'